মণি ডাক্তার

(গল্পগ্রন্থ – কিন্নর দল)

আষাঢ় মাসের প্রথমে জ্যৈষ্ঠের গরমটা কাটিয়া গিয়াছে তাই রক্ষা, যে কষ্ট পাইয়াছিলাম গতমাসে! এই বাগানঘেরা হাটতলায় কি একটু বাতাস আছে?

কিছু করিতে পারিলাম না এখানেও। আছি তো আজ দেড় বছর। শুধু এখানে কেন, বয়স তো প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ ছাড়াইতে চলিয়াছে, এখনও পর্যন্ত কি করিলাম জীবনে? কত জায়গায় ঘুরিলাম, কোথাও না হইল পসার, না জমিল প্র্যাকটিস্। বাগ—আঁচড়া, কলারোয়া, শিমুলতলী, সত্রাজিৎপুর, বাগান গাঁ-কত গ্রামের নামই বা করিব! কোথাও মাসকয়েকের বেশি চলে না । এই পলাশপাড়ায় যখন প্রথম আসি, বেশ চলিয়াছিল কয়েক মাস। ভাবিয়াছিলাম ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন বুঝি। কিন্তু তার পরেই কি ঘটিল, আজ কয়েক মাস একটি পয়সারও মুখ দেখিতে পাই না।

এখন মনে হয় কুণ্ডুবাবুদের আড়তে যখন চাকুরি করিতাম শ্যামবাজারে, সেই সময়টাই আমার খুব ভাল গিয়াছে। আমাদের গ্রামের একজন লোক চাকুরিটা জুটাইয়া দিয়াছিল; খাতাপত্র লিখিতাম, হাতের লেখা দেখিয়া বাবুরা খুশী হইয়াছিল। আট নয় মাসের বেশী সেখানে ছিলাম; তার মধ্যে কলিকাতায় যাহা কিছু দেখিবার আছে, সব দেখিয়াছি। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, পরেশনাথের বাগান, কালীঘাটের কালীমন্দির—কি জায়গাই কলিকাতা!

চাকুরিটা যাইবার পরে পরের দাসত্বের উপর বিতৃষ্ণা হইল। ভাবিলাম, ডাক্তারী ব্যবসায় বেশ চমৎকার স্বাধীন ব্যবসা।কুণ্ডুবাবুদের বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ধরিয়া তাঁহার ডিস্পেন্সারিতে বসিয়া মাস দুই কাজ শিখিলাম। কিছু বাংলা ডাক্তারী বই কিনিয়া পড়াশুনাও করিলাম। তারপর হইতেই নিজের দেশ ছাড়িয়া এই সুদূর যশোহর জেলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এ গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস নাই, হিন্দুর মধ্যে কয়েকঘর গোয়ালা ও কলু আছে, বাকি সব মুসলমান। পলাশপুরে কারো কোঠা বাড়ি নাই, সকলে নিতান্ত গরিব, সকলেরই খড়ের ঘর। খুব বেশি লোকের বাসও যে এখানে আছে তাও নয়। যদি বলেন, এখানে কেন ডাক্তারী করিতে আসিয়াছি, তার একটা কারণ নিকটবর্তী অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে এখানেই হাট বসে। এমন কিছু বড় হাট নয়, তবুও বুধবারে ও শনিবারে অনেকগুলি গ্রামের লোক জড়ো হয়।

হাটতলায় ক'খানা খড়ের আটচালা ও সবাইপুরের গাঙ্গুলীদের ছ'আনি তরফের কাছারি ঘর আছে। কাছারি ঘরখানা দেওয়াল-বিহীন খড়ের ঘর.বছরের মধ্যে কিস্তির সময় জমিদারের তহশিলদার আসিয়া মাস-দুই থাকিয়া খাজনাপত্র আদায় করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং ঘরখানা ভাল করিবার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। ঘরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সারা মেঝেতে ইঁদুরের গর্ত, মটকা দিয়া বর্ষার জল পড়ে, ঝড়-ঝাপ্টা হইলে ঘরের মধ্যে বসিয়াও জলে ভিজিতে হয়। ছ'আনির বাবুদের এহেন কাছারি-ঘরে নায়েবকে বলিয়া-কহিয়া আশ্রয় লইয়া আছি।

একাই থাকি।এ দিকের সব গাঁয়ের মত এ গাঁয়েও বনজঙ্গল, বাঁশবন, প্রাচীন আমের বাগান বড় বেশি। হাটতলার তিনদিক ঘিরিয়া নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান, একদিকে সুঁড়ি জঙ্গলের গা ধরিয়া আধপোয়া পথ গেলে বেত্রবতী নদী-স্থানীয় নাম বেতনা। বনজঙ্গলের দরুন দিনের বেলাও হাটতলাটা যেন খানিকটা অন্ধকার দেখায়, রাত হইলে হাটতলায়লোকজন থাকে না, দু'একখানা যা দোকানপত্র আছে, দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার পরে হাটতলা একেবারে নির্জন হইয়া পড়ে।বনে, ঝোপেঝাড়ে বাঁশবাগানে জোনাকি জ্বলে, ক্বচিৎ ফুটন্ত ঘেঁট্কোল ফুলের দুর্গন্ধ বাহির হয়, উত্তর দিকে শিমুলগাছটায় পেঁচা ডাকে, আমি একা বসিয়া ভাত রাঁধি, কোন কোন দিন ভাত চড়াইয়া দিয়া একতারাটা হাতে লইয়া আপনমনে গান করি।

আজ ছয় সাত মাস একটা পয়সা আয় নাই। হাটে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিয়াছি—চার আনা ভিজিট লইব, ওষুধের দাম দাগপিছু এক আনা। তবুও রোগীর দেখা নাই। ভাগ্যে মুজিবর রহমান লোকটা ভাল, নিজের দোকান হইতে আজ চার পাঁচ মাস ধারে চাল ডাল দেয়, তাই কোন রকমে চলিতেছে।

গোয়ালপাড়ায় দামু ঘোষের বাড়ি একটা নিউমোনিয়া কেস ছিল গত মাসে। মুজিবর এদিকের মধ্যে মাতব্বর লোক, সবাই তার কথা মানে, তাকে ধরিয়া সুপারিশ করাইয়াছিলাম দামু ঘোষের কাছে। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত আমায় না ডাকিয়া ডাকিল গিয়া বলরামপুরের অবিনাশ সেক্‌রা কবিরাজকে। অবিনাশ কবিরাজের ওপর তাদের নাকি অশেষ বিশ্বাস।

সুবাসিনীকে লইয়া হইয়াছে মুশকিল। বিবাহ করিয়া পর্যন্ত তাকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছি। একখানা ভাল কাপড় পর্যন্ত কোন দিন দিতে পারি নাই, ছেলেটির দুধের দাম সাত আট টাকা বাকি, শাশুড়ি ঠাক্‌রুন তাগাদা করিয়া চিঠি দেন; কোথায় পাইব সাত আট টাকা, নিজেই পাই না পেটে খাইতে! টাকা দিতে পারি না বলিয়া শাশুড়ি ঠাক্‌রুন মহা অসন্তুষ্ট, তিনি ভাবেন কত টাকাই না রোজগার করিতেছি ডাক্তারীতে!

কেহ বলিলে হয়তো বিশ্বাস করিবে না, আজ চার পাঁচ মাস একরকম শুধু ভাত খাই। পাড়াগাঁ হইলেও এখানে জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় না বলিয়া অতিরিক্ত আক্রা—পটল দুই আনা সের, আলু ছয় পয়সা। মাছ চার আনা ছয় আনার কম নয়। কেহ দেখিতে পাইবে বলিয়া খুব ভোরে নদীর ধার হইতে শুশুনি আর কাঁচড়াদাম শাক তুলিয়া আনি মাঝে মাঝে। আজকাল আমের সময়, শুধু আম-ভাতে আর ভাত; কতদিন শুধু নুন দিয়াই ভাত খাইয়াছি।

পাসকরা ডাক্তার নই, কিন্তু তাতে কি? বাড়ি বসিয়া বই পড়িয়া কি আর ডাক্তারী শেখা যায় না? আজ সাত আট বছর তো ডাক্তারী করিতেছি, অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা জিনিসও তো আছে! পাস-করা ডাক্তারের হাতে কি আর রোগী মরে না? ধোপাখালির ইন্দু ডাক্তার আসিয়া বিধু গোয়ালিনীর মেয়েটাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিল?

তবে কেন যে দুষ্ট লোকে রটাইয়াছে, মণি ডাক্তারের ওষুধ খাইলে জ্যান্ত মানুষ মরিয়া ভূত হয়, ইহার কারণ কে বলিবে? আমি গরিব বলিয়া আমার দিকে কেউ হয় না, এক মুজিবর ছাড়া—ঐ লোকটা আজ তিন চার মাস বিনা আপত্তিতে নিজের দোকান হইতে চাল ডাল না দিলে আমাকে উপবাস করিতে হইত। সে আমার জন্য যত করিয়াছে, এ অঞ্চলের কেহ তাহার সিকিও কোনদিন করে নাই। তাহার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না।

এ-সব অজ-পাড়াগাঁ। রেলস্টেশন হইতে দশ বারো ক্রোশ দূরে। কাছে কোন বড় বাজার কি গঞ্জ নাই, লোকজন নিতান্ত অশিক্ষিত; রোগ হইলে ডাক্তার ডাকার বদলে জল-পড়া, তেল-পড়া দিয়া কাজ সারে। ফকির ডাকাইয়া ঝাড়ফুঁক করে, বলে অপদেবতার দৃষ্টি হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিবার রেওয়াজই নাই।

বাড়ি যাই নাই আজ দেড় বছর। পলাশপাড়া আসিবার আগে কিছুদিন ছিলাম সত্রাজিৎপুরে, তখন হইতেই যাই নাই। বাড়ি মানে শ্বশুরবাড়ি—নিজের বাড়িঘর বলিয়া কিছু নাই অনেক দিন হইতেই। শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইলে আট ক্রোশ হাঁটিয়া নাভারণ স্টেশনে রেলে চাপিতে হইবে। সেখান হইতে মসলন্দপুর স্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে যাইতে হইবে খোলাপোতা। সেখানে মার্টিন লাইনের ছোট রেলে হাসনাবাদ পর্যন্ত গিয়া ইচ্ছামতীতে নৌকায়ছয় সাত ঘণ্টা গেলে তবে শ্বশুরবাড়ি। সবসুদ্ধ তিন চার টাকা খরচ পড়ে—যখনই হাতে টাকা আসিয়াছে, তখনই মণি-অর্ডার করিয়া সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—তিন চার টাকার মুখ একসঙ্গে কমই দেখিয়াছি আজ দু'বছরের মধ্যে। টাকা না পাঠাইলে শাশুড়ি ঠাক্‌রুনের আর আমার বিধবা শালীর গঞ্জনার চোটে বেচারীকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়।

তাই এবার যখন আসি, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নৌকাতে চড়িব, সুবাসিনী কোণের ঘরে ডাকিয়া বলিল—শোন, এবার আমায় এখানে বেশীদিন ফেলে রেখো না—তুমি যেখানেই থাক, আমায় নিয়ে যেয়ো শিগ্‌গির।

—সেই সব পাড়াগাঁয়ে কি আর থাকতে পারবে?

—এই বা এমন কি শহর? তা ছাড়া তুমি যেখানে থাকবে, সেইখানেই আমার শহর। এখানে দিদির বাক্যির জ্বালায় এক এক সময় মনে হয় গলায় দড়ি দিই, কি গাঙে ডুবে মরি!

—সবাই বুঝি সুবি, আমার যদি একটুকু সংস্থান হয় কোথাও তবে তোমাকে ঠিক সেখানে নিয়ে যাবো। আমিই কি তোমাকে আর কোথাও ফেলে মনের সুখে থাকি ভাবো? তবে কি করি বল—

দরজার বাহিরে পা দিয়াছি, শাশুড়ি ঠাক্‌রুন ওৎ পাতিয়া ছিলেন, বলিলেন—তুমি বাপু অমনি নিউদ্দিশ হয়ে থেকো না গিয়ে! আমার এই অবস্থা, সংসারে একপাল কুপুষ্যি, কোথা থেকে কি করি বল তো? এক কাঁড়ি দুধের দেনা গোয়ালার কাছে, ছেঁড়া কাপড় পরে পরে দিন কাটায়, মা হয়ে চোখের সামনে দেখতে পারিনে বলে এক জোড়া কাপড় কিনে এনে দিয়েছিলাম, তার দাম এখনও বাকি—তোমার তো বাপু এখান থেকে চলে গেলে আর চুলের টিকি দেখা যায় না—কি যে আমি করি, এমন পুরুষমানুষ বাপের জন্মে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই অবস্থায় আসিয়া আজ দেড় বৎসর শ্বশুরবাড়ি-মুখো হই নাই। অবশ্য এর মধ্যে মাঝে মাঝে হাতে যখন যা আসিয়াছে, সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—কিন্তু সবসুদ্ধ ধরিলে খরচের তুলনায় তার পরিমাণ খুব বেশি তো নয়। কিন্তু আমি কি করিব, চুরি-ডাকাতি তো করিতে পারি না।

সত্যই সুবাসিনীকে বিবাহ করিয়া পর্যন্ত বেশি দিন তাহার সঙ্গে একত্র থাকিবার সুযোগ আমার হয় নাই। প্রথম ভাবিতাম, একটা কিছু সুবিধা হইলেই তাহাকে লইয়া গিয়া কাছে রাখিব। কিন্তু বিবাহ করিয়াছি আজ ছয় সাত বছর, তার মধ্যে এ সুযোগ কখনও হইল না। শ্বশুরবাড়িতেই বা গিয়া কয়দিন থাকা যায়! একে তো মেয়ে এতকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তার উপর জামাই গিয়া দুদিনের বেশি দশদিন থাকিলেই শাশুড়ি ঠাক্‌রুন স্পষ্ট বিরক্ত হইয়া উঠেন বেশ বুঝিতে পারি, কাজেই বুদ্ধিমানের মত আগেই সরিয়া পড়ি। নিজের মান নিজের কাছে।

একদিন শুনিলাম পানখোলার পাঠশালায় একজন মাস্টারের পোস্ট খালি আছে। মুজিবর রহমানের দোকানে সকালে বিকালে বসিয়া দুই-একটা সুখ-দুঃখের কথা বলি, সে আমায় পরামর্শ দিল, মাস্টারির জন্যে চেষ্টা দেখিতে।

বাড়ি আসিয়া কথাটা ভাবিলাম।সাত আট বছর ডাক্তারী করিয়া তো দেখা গেল পেটের ভাত জুটানো দায়—তবুও একটা বাঁধা চাকুরি করিলে, মাস গেলে যত কমই হোক, কিছু হাতে আসিবে।

—খবর লইয়া জানিলাম, মকরন্দপুরের শ্রীনাথ দাস ঐ পাঠশালার সেক্রেটারি।পরদিন সকালে রওনা হইলাম মকরন্দপুরে।

মকরন্দপুর এখান হইতে সাত আট ক্রোশের কম নয়। সকালে স্নান সারিয়া দুটি চাল গালে দিয়া জল খাইয়া বাহির হইলাম। মকরন্দপুর কোন্ দিকে আমার ঠিকমত জানা ছিল না, পলাশপুর ছাড়াইয়া অম্বিকাপুরের কলুবাড়ির কাছে যাইতে কলুরা বলিয়া দিল ঝিট্‌কিপোতার খেয়া পার হইয়া নকফুলের মধ্য দিয়া গেলে দেড় ক্রোশ রাস্তা কম হইতে পারে।

সকাল আটটার মধ্যে খেয়া পার হইলাম।একটি ছোট ছেলে আমার সঙ্গে এক নৌকায় পার হইল। মাঠের মধ্যে কিছুদূর গিয়া সে একটা বটগাছের তলা দেখাইয়া বলিয়া দিল—ঐ গাছতলা দিয়ে চলে যান বাবু, বাঁদিকে নকফুলের রাস্তা।

রোদ বেশ চড়িয়াছে। ছোট একটা খাল হাঁটিয়া পার হইয়া বড় একটা আমবাগানের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এসব অঞ্চলের আমবাগান মানে গভীর জঙ্গল। তার মধ্যে অতি কষ্টে পথ খুঁজিয়া লইয়া বাগানটা পার হইয়া যাইতেই একটা কোঠাবাড়ি দেখা গেল। ক্রমে অনেকগুলি দালান কোঠা পথের ধারে দেখা যাইতে লাগিল।অধিকাংশই পুরাতন, প্রাচীন কার্নিসে দেওয়ালেবট-অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। গ্রামখানা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পিপাসা পাইয়াছে। ভাবিলাম, নকফুলে কাহারও বাড়ি জল চাহিয়া খাইলেই হইত। এদিকে শুধুই মাঠ, নিকটে আর কোন গ্রামও তো নজরে পড়ে না।

পুনরায় পথ হাঁটিতে লাগিলাম। পথে সবই চাষাদের গাঁ পড়িতে লাগিল।ব্রাহ্মণ মানুষ, যেখানে সেখানে তো জল খাইতে পারি না!

সুঁদরপুর, চাতরা, নলদি, মামুদপুর ...

তারপরেই পড়িল আর একটা মাঠ। বেলা তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। কিছু খাইতে পাইলে ভালই হইত—পেট জ্বালিয়া উঠিল। আপাতত জল খাইলেও চলিত। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কি ছাই এদিকে কোথাও একটা টিউবওয়েলও দেয় নাই কোন গ্রামে? মাঠের মধ্যে কোথাও কি একটা পুকুর নাই?

মেটে রাস্তায় হাঁটিয়া যখন নদীর ধারে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পৌঁছিয়া দেখি খেয়াঘাট কচুরিপানায় বুজিয়া গিয়াছে, খেয়ার নৌকাখানি ডুবানো অবস্থায় এপারে বাঁধা। কোনও জনপ্রাণী নাই।

কি বিপদ! এখন পার হওয়ার কি করি? নিকটে একটা চাষা গাঁ। সেখানে খোঁজ লইয়া জানিলাম, কচুরিপানায় ঘাট বুজিয়া যাওয়ায় সেখানকার খেয়া আজ মাসখানেক যাবৎ বন্ধ।আরও ক্রোশখানেক উজানে খালিশপুরের ঘাটে খেয়া পড়িতেছে।

এই অবস্থায় মাঠ ভাঙিয়া এক ক্রোশ নদীর ধারে ধারে খলিশপুর পর্যন্ত যাওয়া তো দেখিতেছি বড় কষ্ট! পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—পোয়াটাক পথ গিয়া একটা বড় শিমুলগাছের নীচেনদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

অন্ধকারে আধ মাইল হাঁটিয়া নদীর পারে একটা শিমুল গাছ দেখা গেল বটে, কিন্তু জল সেখানে বিশেষ কম বলিয়া মনে হইল না। জলে তো নামিলাম, জল ক্রমে হাঁটুর উপর ছাড়াইয়া কোমরে উঠিল। কোমর হইতে বুক, বুক হইতে গলা। কাপড়-জামা ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া গেল—তখনও জল উঠিতেছে—নাকে আসিয়া যখন ঠেকিল, তখন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়া ডিঙি মারিয়া চলিতেছি। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে,—ভয় হইল একা এই অন্ধকারে অজানা নদী পার হইতে কুমীর না ধরে! বড় কুমীর না আসুক, দুই-একটা মেছো কুমীরেও তো গুঁতাটা-আসটা দিতে পারে!

কোন রকমে ওপারে গিয়া উঠিলাম। কোন দিকে লোকালয় নাই, একটা আলোও জ্বলে না এই অন্ধকারে। একটা জায়গায় মাঠের মধ্যে দুই দিকে রাস্তা গিয়াছে। মকরন্দপুরের রাস্তা কোন্ দিকে—ডাইনে না বাঁয়ে? কে বলিয়া দিবে, জনমানবের চিহ্ন নাই কোথাও। ভাগ্য আবার এমনি, ভাবিয়া চিন্তিয়া যে পথটি ধরিলাম, সেইটিই কি ঠিক ভুল পথ! আধক্রোশ তিনপোয়া পথ হাঁটার পরে এক বাগদীবাড়িতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—আমি তিনপোয়া পথ উল্টোদিকে আসিয়া পড়িয়াছি। যাওয়া উচিত ছিল ডাইনের পথে, আসিয়াছি বাঁয়ের পথে।

আবার তখন ফিরিয়া গিয়া সেই পথের মোড়ে আসিলাম। সেখান হইতে ডাইনের পথধরিলাম। এইবার পথে বিষম জঙ্গল। বড় বড় আমবাগান, বাঁশবন আর ভয়ানক আগাছার জঙ্গল। আমি জানিতাম, এখানে খুব বাঘের ভয়। দিনমানে গরু-বাছুর বাঘে লইয়া যায়— একবার আমি একটা রোগীর চিকিৎসা করি, তাহার কাঁধে গো-বাঘায় থাবা মারিয়াছিল।

ভীষণ অন্ধকার—রাস্তা হাঁটা বেজায় কষ্ট, পাকা আম পড়িয়া পথ ছাইয়া আছে—এ সব অঞ্চলে এত আম যে আমের দর নাই, তলায় পড়া আম কেউ একটা কুড়ায় না। অন্ধকারে আমের উপর দিয়া পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। আম তো ভাল, সাপের ঘাড়ে পা দিলেই আমার ডাক্তারলীলা অচিরাৎ সাঙ্গ করিতে হইবে, তাই ভাবিতেছি।

অতি কষ্টে মকরন্দপুর পৌঁছিলাম, রাত নয়টার সময়। সেক্রেটারি শ্রীনাথ দাসের বাড়িতে রাত্রে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু চাকুরি মিলিল না, যাতায়াতই সার। পরদিন সকালে শ্রীনাথ দাস বলিল—এ মাসে নয়, আশ্বিন মাস থেকে ভাবছি লোক নেব। ইস্কুলের অবস্থা ভাল নয়। ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সাহায্য আসে মাসে দশ টাকা চার আনা, সেইটিই ভরসা। ছাত্রদত্ত বেতন মাসে ওঠে মোট তের সিকে।দুজন মাস্টার কি করে রাখি? তা আপনি আশ্বিন মাসের দিকে একবার খোঁজ করবেন।

গেল মিটিয়া। আশ্বিন মাস পর্যন্ত খাই কি যে পানখোলা ইউ. পি. পাঠশালার দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদের জন্য বসিয়া থাকিব! বেতন শুনিলাম পাঁচ টাকা। হেড পণ্ডিত পান নয় টাকা।

সারাদিন হাঁটিয়া আবার ফিরিলাম পলাশপুরে। সন্ধ্যা হইয়া গেল ফিরিতে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, পা টন্‌টন্‌ করিতেছে। মুজিবর জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ডাক্তারবাবু? তাহাকে সব বলিলাম, তারপর নিজের অন্ধকার খড়ের ঘরে ঢুকিয়া ভাঙা লণ্ঠনটা জ্বালিলাম। নদীর ঘাট হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া মাদুরটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষুধা খুবই পাইয়াছিল, কিন্তু উঠিয়া রাঁধিবার উৎসাহ মোটেই ছিল না। গোটাকতক আম খাইয়া রাত্রি কাটিল।

অন্ধকারে শুইয়া শুইয়া কত কথা ভাবি। একা একা কাটাইতে হয়, কথা বলিবার মানুষ পাই না, এই হইয়াছে সকলের চেয়ে কষ্ট। ইচ্ছা হয় স্ত্রীকে আনিয়া কাছে রাখিতে। কত কাল তাহাকে দেখি নাই, তাহার একটু সেবা পাইতে সাধ হয়। এই সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া আসিলাম, ইচ্ছা হয় কাছে বসিয়া একটু গল্প করুক, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুখে থাকিব। কিন্তু আনি কোথা হইতে? খাওয়াই কি?

হাটতলায় কি ভীষণ অন্ধকার! মাত্র দুখানি দোকান, তাও দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে বড় বড় গাছপালার অন্ধকারে জোনাকি জ্বলিতেছে, বিলাতী আমড়া গাছটায় বাদুড়ে ডানা ঝট্‌পট্‌ করিতেছে।

গভীর রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু গরমে ঘুম আসে না চোখে।কি বিশ্রী গুমোট! সারারাত্রি ঢুব্‌ঢাব শব্দে পাকা আম পড়িতেছে চারিদিকের আমবাগানে, শুইয়া শুইয়া শুনিতেছি।

উঃ, কি একঘেয়েই হইয়া উঠিয়াছে এখানকার জীবন! সকালে উঠিয়া নদীর ধারে একটু বেড়াইয়া আসিয়া সেই হাটতলায় ফিরিয়া আসি, বেশীদূর কোথাও যাইতে পারি না, কি জানি রোগী আসিয়া যদি ফিরিয়া যায়সারাদিন ডিস্‌পেন্‌সারি আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়আশায় আশায়।

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে

ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব

পাদপদ্ম। কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি—

আর তা ছাড়া যাই বা কোথায়? চাষার গাঁ, কোন ভদ্রলোকের বাড়ি নাই যে বসিয়া গল্পগুজব করি। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই আমার ফুটা খড়ের ঘরের ডিস্‌পেন্সারি আর মুজিবরের দোকান, দোকান আর ডিস্‌পেন্সারি। কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে পিপিলিপাড়ার বিলের ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখি বাগদীরা কি করিয়া ডোঙ্গায় উঠিয়া কোঁচ ছুঁড়িয়া কইমাছ মারিতেছে। অন্ধকারদেখিয়া দুটো হয়তো শাক তুলিয়াও আনি কোন কোন দিন।একঘেয়ে আম-ভাতে ভাত অখণ্ড প্রতাপে রাজ্য চালাইতেছে তো বৈশাখ মাস হইতেই—কতদিন আর ভাল লাগে?

আমার নামের কপাল নয়। কাল ওপাড়ার বিষ্ণু কলুর বড় ছেলেকে সন্ধ্যার পরে ঘানি—ঘরের দরজায় সাপে কামড়াইল, আমি শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম, আমায় কেহ ডাকিতে আসে নাই বটে, কিন্তু কানে শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি কি করিয়া? গিয়াই শক্ত করিয়া গোটাকতক বাঁধন দিলাম, দষ্টস্থান চিরিয়া পটাস্‌ পারম্যাঙ্গানেট টিপিয়া দিলাম—এমন সময় পাড়ার লোকে ওঝা ডাকিয়া আনিল। ওঝা আসিয়াই আমার বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে হুকুম দিল। আমার নিষেধ কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাঁধন খুলিয়া ঝাড়-ফুঁক করিতে করিতে রোগী সারিয়া উঠিল। ঝাড়-ফুঁক সব বাজে, আমার বাঁধনে আর পটাস্‌ পারম্যাঙ্গানেটে কাজ হইয়াছিল—নাম হইল সেই ওঝার। যাক্‌, সেজন্য আমি দুঃখিত নই, একজনের জীবন বাঁচিয়া গেল, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

না খাওয়ার কষ্টও সহ্য করিতে পারি, একঘেয়ে জীবনের কষ্টে একেবারে মারা যাইতে বসিয়াছি। তবুও বসিয়া বসিয়া দিবা-স্বপ্নে কাটাইয়া মনের কষ্ট মন হইতে তাড়াই।

টাকা পয়সা হাতে হইলে কি করিব বসিয়া তাহাও ভাবি।

সুবাসিনীকে লইয়া আসিব, খোকাকে লইয়া আসিব। নদীর ধারে মুজিবর জমি দিতে চাহিয়াছে, সেখানে দুখানা খড়ের ঘর তুলিব আপাতত। বাড়ির চারিধারে ছোট একখানা ফুলবাগান করিব, সন্ধ্যাবেলা আধফুটন্ত বেলকুঁড়ি এই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রেকাবি করিয়া তুলিয়া আনিয়া কিছু ঘরে কিছু সুবাসিনীর খোঁপায় পরাইয়া দিব। এখানকার তহশিলদারকে বলিয়া কিছু ধানের জমিলইয়া চাষবাস করিব, ঘরে ধান হইলে সচ্ছলতা আপনিই দেখা দিবে।

ভাদ্র মাসে একদিন ডিস্‌পেন্সারি ঘরে বসিয়া আছি, দেখি যে একটি মেয়ে হাটতলার বনের মধ্যে জামতলায় কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—কি খুঁজছ ওখানে খুকী?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—ঘেঁটকোলের ডগা

—কি হবে ঘেঁটকোলের ডগায়?

—ঘেঁটকোলের ডগা তো খায়—

কথাটা জানিতাম না। ঘেঁটকোলের ডগা যদি খাওয়া যায়, তবে তো আমার তরকারী কিনিবার সমস্যা ঘুচিয়া যায়। হাটতলার চারিদিকের বন-জঙ্গলেই দেখিতেছি বহু ঘেঁটকোল আছে। কিন্তু গাছটি চিনিতাম না, নাম শুনিয়া আসিয়াছি বটে।

বলিলাম—কৈ, কি রকম গাছ দেখি?

মেয়েটি বলিল—এই দেখুন, কচুগাছের মত দেখতে। কিন্তু একটা পাতা তিনটে ভাঁজ করা।

—কি করে খায়?

—যেমন ইচ্ছে, ছেঁচ্‌কি করে খায়, চচ্চড়ি করেও খায়। খাবেন, দেব তুলে?

মেয়েটির কাছে একটু চাল দেখাইলাম। ডাক্তারবাবু হইয়া বুনো ঘেঁটকোলের ডগা কি করিয়া খাইব! তবে যদি নিতান্তই খাইতে হয়, সে এই অবজ্ঞাত বন্য উদ্ভিদের প্রতি নিতান্ত কৃপা করিয়াই খাইব,—এই ভাবটা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

বলিলাম—ওসব কচু-ঘেঁচুর ডগা কে রাঁধবে? কি করে রাঁধতে হয়?

মেয়েটি শিখাইয়া দিল, ঘেঁটকোলের ডগার ছেঁচ্‌কি রাঁধিবার প্রণালী, এক আঁটি ডগা তুলিয়া দিয়াও গেল।

যাইবার সময় আমার রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—এখানে কে থাকে?

—আমিই থাকি।

—সে কথা নয়, আপনার সঙ্গে থাকে কে? রেঁধেবেড়ে দেয় কে?

—কেউ না, নিজেই।

সেই হইতে মেয়েটি আমায় কেমন একটু কৃপার চক্ষে দেখিল বোধ হয়। যখনই সে হাটতলায় ঘেঁটকোলের ডগা সংগ্রহ করিতে আসিত—আমায় এক আঁটি দিয়া যাইত।

সকালের দিকেও আসিত, আবার বৈকালেও আসিত। একদিন বৈকালে আপনমনে বসিয়া আছি, মেয়েটি আসিয়া দাওয়ার ধারে কোঁচড় হইতে কিছু ডুমুর বাহির করিয়া রাখিয়া বলিল—এ বেলা হরে কলুদের পুকুরপাড় থেকে ডুমুর পেড়েছিলাম, তাই আপনাকে দুটো দিয়ে যাচ্ছি।

মেয়েটি কে তা আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। মেয়েটি দেখিতে ভাল, বেশ বড় বড় চোখ, বয়েস আঠারো উনিশ হইবে। গায়ের রং যতটা ফর্সা, এ সব পাড়াগাঁয়ে তত সুন্দর গায়ের রং প্রায়ই দেখা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ঘরের মেয়ে নয়—দেখিলেই বোঝা যায়। সেদিন তাহার পরিচয় লইয়া জানিলাম সে সেই

গ্রামেরই বিধু গোয়ালিনীর মেয়ে, তার ভাল নাম সম্ভবত প্রেমলতা বা ঐ রকম কিছু, সবাই 'প্রমো' বলিয়া ডাকে। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, যেমন সাধারণত আমাদের দেশে গোয়ালার ঘরে হয়।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—আপনার বিয়ে হয় নি?

—কেন হবে না?

—তবে বৌকে নিয়ে আসেন না কেন? এখানে তো আপনার রান্নাবান্নার খুব কষ্ট!

—হ্যাঁ, তা বটে। এইবার আনব ভাবছি।

—মা বাবা আছেন?

—নাঃ!

—কোথায় আপনার বাড়ি?

—সে তুমি চিনতে পারবে না, সে অনেক দূর।

এইভাবে আলাপের সুত্রপাত। তারপর কতদিন সকালে বিকালে প্রমো আসিত, কোন দিন ওলের ডাঁটা, কোন দিন ডুমুর, কোন দিন বা একটা চালতা, নিজে যা বনেজঙ্গলে সংগ্রহ করিত, তার কিছু ভাগ আমায় না দিয়া তার যেন তৃপ্তি হইত না। মাঝে মাঝে ওইখানটায় দাঁড়াইয়া চালের বাতা ধরিয়া কত গল্প করিত। সরলা বালিকা কাঠ কুড়াইয়া, শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া তার দরিদ্র মায়ের গৃহস্থালীর অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিত, তেমনই এই দরিদ্র ডাক্তারের প্রতি গভীর অনুকম্পাবশত তার ভাতের থালার উপকরণও জুটাইয়া দিত। বড় ভাল লাগিত তাকে। একটা অদৃশ্য সহানুভূতির সূত্রে সে আমাকে বাঁধিয়াছিল এবং বোধ হয় আমিও তাকে বাঁধিয়াছিলাম। পলাশপুরের হাটতলার নিঃসঙ্গ জীবনে একটি মমতাময়ী নারীর সঙ্গ বোধ হয় খুব ভালই লাগিয়াছিল। তাই সে আসিলে মনটা খুশী হইয়া উঠিত। ইদানীং সে আসিতও ঘন ঘন, নানা ছলছুতায়, কারণে অকারণে। আসিয়া খেইহারা কথাবার্তায় থাকিয়া যাইতও অনেকক্ষণ।

একদিন লক্ষ্য করিলাম, প্রমো তার বেশভূষার দিকে নজর দিয়াছে। প্রথম সেদিন তার যত্ন করিয়া বাঁধা খোপাটির দিকে চাহিয়া আমার এ কথা মনে হইল। ফর্সা শাড়িখানা পরিপাটি করিয়া পরিতে শিখিয়াছে। মুখের হাসির মধ্যে একদিন সলজ্জ সঙ্কোচের ভাব দেখিলাম, যে ধরনের হাসি তার মুখে নতুন। আর কত ভাবেই সেবা করিতে সে চেষ্টা করিত—শাক তুলিয়া, তরকারী কুটিয়া দিয়া। আগে আগে আসিয়া চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, ইদানীং দাওয়ার কোণে ওইখানটায় বসিত। তার মুখের ভাব দিন দিন যেন আরও সুশ্রী হইয়া উঠিতেছিল।

পলাশপুরে তো কত লোক আছে, হাটতলায় তো কত লোক যাতায়াত করে, এই দরিদ্র ডাক্তারের নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি কেহই তো অমন দরদ দেখায় নাই—তাই বলি পুরুষমানুষের মেয়েমানুষের মত বন্ধু কোথায়!

গত ফাল্গুন মাসে উপরি উপরি কয়েকদিন সে আসিল না। মনটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এমন তো কখনও হয় না। দু-তিন দিন পরে কানে গেল বিধু গোয়ালিনীর মেয়ের টাইফয়েড হইয়াছে। কেহ ডাকিতে না আসিলেও দেখিতে গেলাম। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, এ বয়সে টাইফয়েড, শিবের অসাধ্য রোগ। প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলাম—উহারা সাতদিন পরে আমার উপরে আস্থা হারাইয়া ডাকিল ইন্দু ডাক্তারকে।আমাকে রোগশয্যার পাশে দেখিয়া প্রমোর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল প্রথম দিন। শুনিলাম ইন্দু ডাক্তার যেদিন দেখিতে আসিয়াছিল, সেদিন সে ইন্দু ডাক্তারের ঔষধ খাইতে চায় নাই। মরণের ছয় সাত দিন পূর্ব হইতে সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।

আজ কয়েক মাস হইল আমি আবার যে একা সেই একা।কে আর আমার জন্য শাক, ডুমুর, ঘেঁট্কোলের ডগা তুলিয়া দিবে? এখন আবার সেই আম-ভাতে ভাত!

বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে বেজায় কাদা, মশার উৎপাত বাড়িয়াছে।হাটতলার চারিপাশের বাগানের বড় বড় গাছের মাথায় সারাদিন ধরিয়া মেঘ জমিতেছে, ঝুপ্—ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িয়া আকাশ একটুখানি ফরসা হইতেছে ...আবার মেঘ উড়িয়া আসিতেছে, আবার বৃষ্টি। জলে ভিজিয়া গাছের গুঁড়িগুলির রং আবলুসের মত কালো দেখাইতেছে।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। মনে হয় কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছি। যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, মুজিবরের দোকানে গিয়া বসি। নীচু চালাঘরের দোকান, রেড়ির তেল, কেরোসিন তেল, জিরেমরিচ, খড়িমাটি, কড়া তামাক, আলকাতরা, পচা সরষের তেল—সবে মিলিয়া কেমন একটা গন্ধ ঘরটায়। গন্ধটায় মন হু-হু করে, মনে হয় এ কোথায় পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া আছি! কবে বেড়াজালের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইব, আদৌ মুক্তি পাইব কিনা তাই বা কে জানে? জীবনটা যেন কেমনধারা হইয়া গেল। তবুও যদি—এত কষ্টেও এই একঘেয়ে অজ পাড়াগাঁয়েও, আমার মনে হয়, সব কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম, যদি সুবাসিনী ও খোকা কাছে থাকিত।

একবার যখন কলিকাতায় থাকিতাম, ভবানীপুর দিয়া আসিতেছি, দেখি একটা বড় বাড়ি হইতে দলে দলে মেয়েরা বই হাতে করিয়া বাহির হইতেছে। নানা বয়সের মেয়ে আছে তার মধ্যে।

ভাবিলাম—এ কি, এত মেয়ে আসে কোথা হইতে? ব্যাপার কি একবার দেখিতে হইতেছে।

তারপর জানিলাম—সেটা একটা মেয়েদের কলেজ।

কি চমৎকার সব মেয়ে ছিল তার মধ্যে! কেমন সব পরনে, কেমন চশমা, কি রূপ! আর একবার দেবেন্দ্র ঘোষ স্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলাম, একটি বড়লোকের বাড়ির দোতলায় কোন এক মেয়ে গান গাহিতেছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলাম। অমন সুন্দর গান তারপর আর কখনো শুনি নাই। কোথায়ই বা শুনিব? গানের কয়েকটি লাইন এখনও মনে আছে।

প্রিয় তুমি আস নাই আজ ভোরে।

মধুমালতীর নয়নে শিশির দোলে।

সে সব গান আমাদের মত মাটির মানুষের জন্য নয়।

সারাদিন ঝম্—ঝম্ বৃষ্টির পরে সন্ধ্যার সময়টা একটু বাদল থামিয়াছে। গাছপালার অন্ধকারের সঙ্গে আকাশের অন্ধকার মিলিয়া হাটতলা যেমন নির্জন, তেমনি অন্ধকার। ডোবার জলে মনের আনন্দে ব্যাঙ ডাকিতেছে, প্রমো যেখানে ঘেঁট্কোলের ডগা তুলিয়া বেড়াইত, সেই সব বনে ঝিঁঝি পোকার দল একঘেয়ে ডাক জুড়িয়া দিয়াছে।জাম গাছের উচু ডালটা হইতে দমকা হাওয়ায় ছড়ছড় করিয়া পাকা জাম বনের মধ্যে অন্ধকারে জলেভেজা শেওড়াবনের মাথায় পড়িতেছে।

নির্জন সন্ধ্যায় একা বসিয়া ভাবি...